আবদেল করিমের ফাটা জুতো

শহীদ আহম্মদ খান (মন্টু)

আবদেল করিম একজন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ। বর্তমানে বংশ পরম্পরায় পারস্যের নিভৃত প্রান্তে সিরাজ নগরীর বাগ-বাগিচা ভরা অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর একটি গ্রামের বাসিন্দা, আবদেল করিম। তার তিন কুলে এখন কেউ নেই বললেও ভুল হবে না। বুড়ো আবদেল করিমের বুড়ী সংসারের সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে পরপারে চলে গেছেন অনেকদিন হয়। তার মরণের পর ১ ছেলে ১ মেয়ে বাপের সঙ্গে ছিল। মেয়ে বয়সে বড়। ছোট ভাইকে সে আদর - স্নেহ , মায়া-মমতা দিয়ে গড়ে তোলে। এক সময় ছেলে এবাদুল করিম সুস্থ,সমর্থ ও জোয়ান হয়ে উঠে। ওর বড় কুলসুমাও এখন সুন্দরী যুবতী। মাথায় সুন্দর জাফরানী রং এর আবরণী ও পরনে- রং বেরংয়ের ঘাঘরা। হাসি-খুশীতে উচ্ছ্বল পারস্য কন্যাকে এখন অনেক যুবকেই কামনা করে। এখন সে তাদের স্বপ্নরাণী। কথায় কথায় এসে যায় ইতিহাস। কথা কয় তা। এখানেই একদিন শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন সিরাজ নগরীর গৌরব ফেরদৌসী, অমর কবি। অসংখ্য বাগ-বাগিচায় ভরা ফুলের সুগন্ধে মৌ মৌ প্রবাহে ধন্য আর অতি সুন্দর নহরগুলির নৃত্য-চঞ্চল ছন্দ যখন আকুল হয়ে উঠতো তখন অমর কবি ফেরদৌসির কবিতার ছন্দ গুলি তাদের সাথে সাথে নেচে গেয়ে উঠতো। যাই হোক আমাদের কথায় এসে যাই। ছেলে এবাদুল করিম এখন বাপকে জুতো সেলাই এর কাজে সাহায্য করে, মেয়ে অপূর্ব বুটিদার রং-বেরং এর ওড়না তৈরী করে। আবদেল করিম এর জুতোর খ্যাতি সিরাজ নগরীর সর্বত্র। তার একটা ছোট জুতোর কারখানা ছিল। তার চকচকে ছোট পাথর বসানো-নাগরা জুতো নগরীর আমীররাও আগাম অর্ডার দিয়ে কিনতেন। ফলে আবদেল করিম ও ক্রমে ধনী হয়ে ওঠে। মেয়ের ওড়না ও হেরেমের বিবিরা চড়া দামে কিনতেন। ছেলেও বাপের সহায়তায় জুতো তৈরীতে এক্সপার্ট হয়ে ওঠে। মোটকথা তারা সবাই এখন সুখী হাসি-খুশী, বেশ সুন্দর ছিম-ছাম একটি কুটিরে থাকে। পাশেই বাগান এবং কিছু দূরে নহর (ঝর্ণা) তির তির করে বয়ে যায়, বসন্তে মৌমাছি গুনগুন করে। তাদের ফুল ভরা বাগ-বাগিচায় সুন্দরপ্রভাতে নাম না জানা পাখিরা গান গেয়ে যায়, বুঝি বসন্তের আগমনী গান। ঋতুরাজ বসন্তের মিষ্ট গন্ধভরা মন পাগল করা মলয় প্রবাহ তখন চঞ্চল যুবক-যুবতীর অস্থির হিয়ায়। এমনি ভাবে দিন চলে যায় আনন্দ-বেদনায় এই সুন্দর পরিবেশে সুখী সচ্ছল পরিবারটির, এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পরও আবদেল করিমের কঞ্জুস স্বভাব তার ছেলে-মেয়ের মনে ব্যাথার সৃষ্টি করে। তারা ভীষণ লজ্জিত পাড়া-পড়শীর কাছে, যখন তারা প্রত্যেকে ওদের বাপের-কীর্তি কাহিনী নিয়ে কানাঘুষা করে। টাকা-পয়সা ওই কঞ্জুস অতি যত্নে সিন্ধুক ভর্তি করে। ঠিক মতো খায়না, পুত্র-কন্যাকে ও সীমিত খাবার দেয়। আবদেল করিম এর কখন জানি একটা আলখাল্লা ছিল যা দর্জি মোস্তফা সেলাই করে

দিয়েছিল। সে যে কত বৎসর মনে পড়ে না। অনেক গুলো তালি পড়েছে আলখাল্লাটিতে। মেয়ে যত্ন করে ওটা ধুয়ে দিলে আবদেল করিম ওকে তিরস্কার করে। কেননা তাতে সাবান খরচ হয় অতিরিক্ত।

মাথার পাগড়ীর তো কথায় নেই, কত ছার-পোকা যে ওখানে কিলবিল করছে, সেগুলো অসংখ্য বললে ও বেশী হবে না। ওদের আস্তানা হয়েছে ওর লম্বা বাবরী চুলে, তাই রাত্রে ওরা যখন কামড়ায় তখন ওর ঘুম হয়না। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে আবদেল করিম, চোখ দুটো তখন জবা ফুলের মত টকটকে লাল হয়ে
ওঠে। তাই ছেলে মেয়ে সাহস করে কাছে ঘেঁষেনা। তবুও মেয়েটি বাপের চুল বেছে অসংখ্য ছারপোকা নিধন করে।

বাপকে রাগ করে বলে 'এই পুরনো ময়লা নোংরা ছারপোকা ভরা পাগড়ী ফেলে দাও'। তখন খরচের কথা ওঠে, বাপজি মুখ ভেংচে বলে 'হতচ্ছাড়ী তোর বাপের অনেক টাকা না রে ?' যাই হোক বুড়ো মেয়েটিকে খুব ভালবাসে তাই আর বেশী রাগ করে না। ছেলে আজকাল পাগড়ী আর শেলওয়ার নতুন নতুন কিনে। তার উপর আনকোরা নতুন মুক্তা বসানো নাগরা ব্যবহার করে বলে ওর বাপ ওকে দেখলে ধমকায়। যাই হোক সে বাপের ধমককে গ্রাহ্য করেনা। কারণ সে নিজের পরিশ্রম লব্ধ উপার্জনে চলে। বলা বাহুল্য বুড়ো খুব খুশী এতে। এত কিছু তবু সহ্য হয় কিন্তু বুড়োর জুতো জোড়া এত পুরনো হয়েছে যে পঁচা চামড়া বিকট দুর্গন্ধ ছড়ায়। সে দুর্গন্ধে টিকে থাকা কি সাধ্যি, আবার জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে, অনেক তালি দেওয়ায় জুতো জোড়া হয়েছে অসম্ভব ভারি, পেঁরেক উঠে গিয়ে আঙ্গুলে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। রক্ত ঝরে অবিরল বুড়োর পায়ে, তবুও জুতো জোড়া বদলাবে না। শেষ পর্যন্ত মেয়ে একরকম জোর করে নাগরা জুতো পরায় বাপকে,যা আনকোরা। বুড়ো হেসে পথ চলে এখন। কারণ আরাম পায়। এখন ভীষন সমস্যা হলো এই ভারী দুর্গন্ধ ছড়ানো জুতো গুলি কোথায় ফেলা যায়। মাটি খুঁড়ে কবর দিলে আপদ ফুরাতো। কিন্তু বুড়োর মাথায় ছিল কতকগুলো গোবর। তা ছাড়া টাকা-টাকা হায় টাকা বলে বুক চাপড়াতে থাকলে মগজ ঠিক থাকার কথা নয়। নাগরা জুতোর চামড়ায় লেগেছে খরচ, কাপড় বদলেছে তাও আর এক খরচ। মেয়ের বিয়েতে টাকা লাগবে তাও আর এক খরচ। খরচ আর খরচ। তাই মগজের দোষ কি। শেষে হঠাৎ করে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে জুতো জোড়া স্থানীয় এক আমীর বা শাসন কর্তার ড্রেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এবার হলো ভীষণ গোলমাল। আমীর বাহাদুরের ড্রেনের ময়লা পানি আবর্জনার চলাচলের মুখে জুতো জোড়া হাঁ করে থাকায় পানি-বদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গেল। আমীর বাহাদুর ফরমান জারী করলেন যে ভাবে হোক এ দুর্গন্ধের উৎস বার করতে হবে। দলে দলে লোক লেগে গেল, বিরাট হৈ-চৈ। মেথর গোষ্টি ভাঁড়ে-ভাঁড়ে মদ গিলে বিরাট ড্রেন পরিস্কার লেগে গেল। মণকে মণ ময়লার স্তূপ সরিয়ে শেষ পর্যন্ত বার হল দেড় মণ ভারী বুট। এ বুট যে কঞ্জুস করিমের সেটা আর বুঝতে বাকী রইলো না কারো। বুট জোড়া পড়বি ত পড়, এক্কেবারে আমির বাহাদুর দি রয়েল টাইগার ওরফে বাঘার সামনে গিয়ে পড়লো। বারুদের স্তূপে আগুন লেগে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ এর সৃষ্টি হলো। আমীর বাহাদুর এর গনগনে

আগুনে চেহারা তখন ভয়ঙ্কর,চাওয়া যায় না, তিনি উন্মুক্ত সূর্যের আলোয় ঝলসানো তরবারী ঘুরিয়ে হুকুম দিলেন ধরে আন কঞ্জুস ব্যাটাকে, একদম খতম করে ফেল শালাকে। আমীর এর গর্জনে তখন মাটি থরথর কম্পমান। ছুটল লাঠিয়াল,ছুটল কতোয়াল। নিমেষে তারা হাজির হলো আবদেল করিমের আঙ্গিনায়। মেয়ে কেঁদে বাপকে জড়িয়ে ধরল।

বলল, না না না ওগো তোমরা আমার বাপকে মেরো না। ছেলে এগিয়ে এলো গদা নিয়ে কোতয়ালকে আঘাত করতে। সে রাগে থর থর করে কাঁপছে। এমনিতে টকটকে লাল চেহারা, রাগে আগুন শিখার মত আরও লাল হয়ে গেল। যুবতীর আর্তনাদে কোতয়াল একটু নরম হয়েছিল কিন্তু এবাদুল করিমের অগ্নিমূর্তি কোতয়ালের রাগ বাড়িয়ে দিল বহুগুণে।
হুকুম দিল সগর্জনে বরকন্দাজদের 'আক্রমণ কর'। শুরু হলো নির্মম নিষ্ঠুর আঘাত। এবাদুল করিমের মাথা ফেটে হু হু করে ছুটলো তাজা লাল রক্তের প্রস্রবণ। এবাদুল করিম ঢলে পড়লো একদিকে আর যায় কোথায় মুহূর্ত আগের ক্রন্দনরত যুবতী দু'হাতে অশ্রু মুছে রণরঙ্গিণী বেশে মহাবীর রুস্তম বংশোদ্ভূত ইরানি যুবতী কুলসুমা মারাত্মক কেউটের মত ফুলে ফুলে নাচতে লাগল। কোমরে ওড়না শক্ত করে পেঁচিয়ে দীর্ঘ কালো কেশে বেণী বেঁধে শক্ত গোরজ (গদা) হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো বরকন্দাজদের উপর সিংহী বিক্রমে। ভন ভন করে গদা ঘুরছে মনে হচ্ছে ঘূর্ণির বেগ। ৮/১০ জনের মাথা ফাটিয়ে উষ্ণ রক্ত ঝরিয়ে লালের বন্যা সৃষ্টি করে হিংস্র বীর নারী সখিনার মত রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে জোয়ান বরকন্দাজদের নির্মম নিষ্ঠুর গদাঘাতে।

প্রতিবেশীদের অনেকেই এ মর্মান্তিক নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখলো কিন্তু কেই এমনকি মুখেও একটু বাধা দিল না, কারণ এরা সবাই আমীরের বরকন্দাজ এদের কিছু বললে রাজ রোষে পড়বে, নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের ঘর-বাড়ি উচ্ছেদ থেকে শুরু করে জান এর উপরে হামলাও বিচিত্র নয়। এখানেই ঘটনা শেষ হলো না। আমীরের লোকেরা কোতোয়ালের আদেশে লুকিয়ে থাকা জরুথবু বৃদ্ধ করিমকে হাতে পায়ে বেঁধে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল আমীরের দরবারে তখন ছেলেমেয়ে উভয়ে রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন। সেখানে অকথ্য অত্যাচার হলো বুড়োর উপর যাকে অমানুষিক ও নিষ্ঠুর বলা যায়।

এবার কোড়া মারার পালা। স্বয়ং আমীর প্রাথমিকভাবে মনের সাধ মিটিয়ে কোড়া মারলেন। শুধু তাই নয় বুড়োর সমস্ত শরীরে ফুটন্ত টগবগে গরম পানি ঢেলে দেওয়া হলো। বুড়ো প্রচন্ড আর্তনাদে ঝিমুতে লাগলো। ক্রমশঃ অজ্ঞান হয়ে নিথর হওয়া আরম্ভ করলো। ঠিক সে সময় প্রাথমিক চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে ছেলে মেয়ে এখানে এসে পড়লো, ওরা আমীরের হাতে-পায়ে দরে টলতে লাগলো। কি জানি জানোয়ারের ও বোধ হয় কোন সময় একটু দয়ার সঞ্চার হয়। তাই আমীর ওদের বৃদ্ধ মৃতপ্রায় বাবার দেহ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দান করলেন। ওরা যখন ঘরে ফিরলো তখন আবদেল করিম একটু শ্বাস টানছে, যদিও গুরুতর আহত। অনেক সাধ্য-সাধনার পর স্থানীয় হেকিম সাহেব বুড়োর সমস্ত শরীরে মলমের প্রলেপ দিয়ে পট্টি

লাগিয়ে দিলেন, কিছু খাওয়ার বড়িও দিলেন। ক্রমে বুড়ো একটু একটু করে সুস্থ হয়ে ওঠা আরম্ভ করলো।

ওঃ বলতে হয়তো একটু ভুল হলো, বুড়োর মৃতপ্রায় দেহের সাথে মহামান্য আমীরের নির্দেশে ঐ পুরনো দুর্গন্ধ ভারি বুট জোড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ওর কণ্ঠে। অবশ্য ভাল করে বেঁধে দেওয়া হলো। এটা শাস্তির শেষ ধাপ। কিন্তু শাস্তি এখানেই শেষ নয় আরও আছে, ক্রমে দুঃখের দিন যায়,রাত্রি আসে,আবার দিন হয়। ছেলে মেয়েও অসুস্থ, তবু কাজ করে এবং আহত বাবার সেবা করে। অবস্থা একটু ভাল হয়ে আসতে মহামান্য আমীরের ফরমান এলো, যেহেতু আবদেল করিম ক্ষতিকর লোক, কঞ্জুস,বা তার দ্বারা আরও অনেকের ক্ষতি হতে পারে তাই মহামান্য আমীর জনসাধারণের হিতার্থে এইরূপ একটি জঘন্য প্রাণীকে আগামী সাত দিনের মধ্যে সপরিবারে ঘরবাড়ী ছেড়ে সিরাজ নগরী ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন।

এই আদেশ অমান্য করলে ওদের সপরিবারে হত্যা করা হবে। আপাততঃ ওদের ঘরবাড়ি সরকার বাজেয়াপ্ত করবে,তবে যাওয়ার সময় নেহাৎ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হবে না। এরপর কি যে হবে ছেলেমেয়ে দুজনই অনুমান করছিল, পাড়া-পড়শীরাও এ বিষয়ে জ্ঞাত ছিল। কারণ সে দেশের আমীর ছিল জুলুমবাজ এবং ভয়ঙ্কর জেদী। একবার তিনি যা সিদ্ধান্ত নেন তা থেকে একচুল নড়বেন না। সুতরাং তারা সবাই পরামর্শ দিল যাতে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হয় নচেৎ ফলাফল হবে ভয়াবহ। ছেলেমেয়ে দুজনা এখনও অসুস্থ তবুও আহত বাবাকে যথাসাধ্য সাহায্য সহযোগিতা দান করল। জিনিস পত্র তারা গুছাতে কসুর করলো না। এতদিনের সংসার সোজা ব্যাপার ত নয়। আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর আগে এখানে আবদেল করিম আস্তানা বেঁধেছিল। কোথায় যাবে কি ভাবে চলবে এটা এখন মস্ত চিন্তার বিষয়। ফার্সী প্রবাদ বাক্য এখন তাদের এ বিষয়ে অনুপ্রেরণা জোগাল 'তীরে কে বদাস্ত ম্যান মিরওয়াদ বে ফায়দা আফসোস্ মাকান্দ,'হাতছে,জোতীর ছোট গ্যয়ে ওসকে যিকর না করনা, অর্থাৎ যা এখন হাতছাড়া হয়ে গেল তার চিন্তা না করাই উত্তম, এখন গড়ার কর্মকান্ডে মেতে উঠতে হবে যা গেছে তা গেছেই, এ সুন্দর পরিবেশ ছিমছাম গৃহ চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে হবে, এতে তাদের হৃদয় কুঁকড়ে যাচ্ছে, বুড়ো একে এখনও আহত আবার অন্যদিকে ঘটনার আকস্মিতায় সে প্রায় মুক হয়ে পড়েছে। সে এখন অসহায় পঙ্গু বললে ও বেশি হয় না। তবু ও যেতোতো হবেই। প্রথমে এই বিশ্রী, জঘন্য জুতো জোড়া আবার যাতে বিপত্তি সৃষ্টি না করতে পারে সে চিন্তা করে মাটি খুঁড়ে সেগুলো মাটির অনেক নিচের স্তরে পুঁতে ফেললো এবাদুল করিম। তারপর বিছানাপত্র ও কম্বল, ঘটিবাটি সব এক জায়গায় করে ভার বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাহনদন্ডের ব্যবস্থা করা হলো। এখন যেখানে যাচ্ছে সেখানে ভবিষ্যৎ সংস্থান অবশ্যই করতে হবে। এবাদুল করিম ও কুলসুমার যা উপার্জন এতদিনে সঞ্চিত হয়েছে এবং বুড়োর পূর্বে অর্জিত মোহরগুলো মিলিয়ে বেশ কয়েকমাস এবং এক বৎসর ও চলে যেতে পারে। তারপরের চিন্তা তারা করছে না,আল্লাহ্ গফুরুর রহীম। রহমানের রহীম অবশ্যই রেজেক দেবেন। তারা জওয়ান। সুস্থ সমর্থ, খেটে খাবে। তাই তারা নিশ্চিন্ত। যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। আজ সপ্তম দিন ফরমানের মঞ্জুর করা সময় শেষ। যদিও ইরানে তেমন বৃষ্টি হয় না

তবু ও আজ মেঘ করেছে বুঝি ওদের বিদায় বেদনায় ক্রন্দসী হয়ে উঠেছে আকাশ। একটু পরেই ঝরঝরা করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বাগ বাগিচায় পাখিরা কুজন করছে মনে হয় বৃষ্টির ফোঁটা তাদের সোহাগ স্নান করিয়ে দিচ্ছে যেমন জননী তার শিশুকে অতিস্নেহে স্নান করান। ওদিকে অজস্র নাম না জানা অনেকগুলো ফুলের সাথে রক্তাক্ত গোলাপ বিচিত্র বর্নের শেফালী চম্পা বৃষ্টি স্নাত হয়ে চৌদিকে সুগন্ধে ভরে তুলেছে এর সাথে তাল মিলিয়ে কোকিলের কুহুতানও অপূর্ব। ভাই-বোনের চোখে তখন অশ্রুর বন্যা, এই এত সুন্দর এত মনোহর প্রকৃতি লীলা তাদের বুঝি বিদায়ী করুণ সানাই এর বেদনাবিধুর ক্রন্দনে বিদায় সংবর্ধনা জানাচ্ছে। এ দৃশ্য যেন একটি নবোঢ়ার পতিগৃহে যাত্রার বেদনাঘন দৃশ্য। এখন ফি আমানিল্লাহ,আল্লাহর নামে ওরা চললো। জিনিস বেশী হয়ে যাওয়ায় পাড়ার লোকেরা দুটি বলিষ্ট গাধা দান করলো। বুড়োকে নিয়ে হলো যত মুস্কিল। হাঁটতে পারে না সে, পা থর থর করে কাঁপে, মাথা ঘুরে, আবার আহত ক্ষত - বিক্ষত, শরীর বেদনায় কুঁকড়ে ওঠে।

এবার পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে উষ্ণ আলিঙ্গনের পালা। দলে দলে শিশু, কিশোর, যুবক - যুবতী, বৃদ্ধ - বৃদ্ধা প্রগাঢ় আলিঙ্গনের পর চোখের জলে ওদের বিদায় দিল। সীমাহীন আবেগে কিশোর - কিশোরী, যুবক - যুবতী হাহাকারের সাথে বুক ভাঙ্গা কান্নায় উচ্চ কণ্ঠে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলো। কুলসুমা আর এবাদুল করিমের চক্ষেও তখন উচ্ছল বন্যা, ওরা উচ্চস্বরে বিলাপ করে করে অগ্রসর হলো। এ যাত্রা ওদের অজানার যাত্রা। ওরাই জানে না কোথায় যাবে কতদুরে গিয়ে সে যাত্রা শেষ হবে। দূরে বহুদূরে সিরাজের উপকূল ছাড়িয়ে যেখানে পারস্য উপসাগর ও দুর্ভেদ্য বন - বনানী দিগন্ত রেখায় মিলিয়ে যাচ্ছে সেখানেই ইরান - ইরাক সীমান্ত। আপাততঃ এখানেই তারা যাবে মনস্থ করলো। প্রায় পাঁচ বৎসর আগে মামা ও মামী এক শিশু কন্যা নিয়ে সিরাজে এসেছিলেন। এরা ছিলেন বড় দয়ালু। মামা সুন্দর, মামী সুন্দরী, শিশুটি বেশ ডাগর তুলতুলে নরম সুন্দর, ওকে কোলে নিয়ে কুলসুমা বেশ মেতে উঠেছিল। আনন্দে সোহাগে, চুমোয় চুমোয় শিশুটিকে অস্থির করে তুলেছিল। আমরা জানিনা ওরা সে এলাকায় পৌঁছেছিল কিনা, যদি পৌঁছে ও থাকে ওরা পুনর্বাসিত হলো কিনা, তবে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় উপরে রয়েছেন, তিনি অবশ্যই ওদের দুঃখ মুছে দেবেন।

এই যে অসহায় অবস্থা, এই দৈন্য এর জন্য দায়ী কে? দায়ী ওদের বাপের কার্পণ্য, মিতব্যয়ী হওয়া ভাল তবে কার্পণ্য ঘৃণার বস্তু। কার্পণ্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ কখনো তা ভয়াবহ পরিণাম সৃষ্টি করে। আবদেল করিমের ফাটা জুতো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে কঞ্জুসী বা কার্পণ্যের সংশোধনের জন্য মর্মান্তিক শাস্তির প্রয়োজন হয় না, এর জন্য মানসিক শাস্তিই যথেষ্ট। আর একটা কথা না বলে পারছি না, মধ্যযুগে কোন কোন শাসকগোষ্ঠি ছিলেন নির্মম, রক্তপিপাসু জুলুমবাজ তারা চাইতেন বশ্যতা, কপট চাটুকারদারের মিষ্টি মিষ্টি কথায় পরিতুষ্টি লাভ করা। তাছাড়া তাদের এলাকায় ছোটখাট কেউ প্রবেশাধিকার না পাক বা যে কোন কারণে ভুলে সামান্যতম কোন অপরাধ করুক এটা তারা চরম বেয়াদবী মনে করতেন তা ছাড়া তারা ছিলেন পরনারী ও পরদ্রব্য লোভী যারা এ সমস্ত জোগানে সহায়তা না দিত তারা বেয়াদব বলে গণ্য হতো। এর জন্য দরিদ্র, দুর্বল অসহায় মানুষকে তারা কঠিন শাস্তি দিতে ইতস্ততঃ করতো না।

এতে কোন জানহানি ঘটলে বা বাসগৃহ উচ্ছেদ হলে তারা পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করতেন। একে সাহিত্যের ভাষায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলা হয়। কিন্তু ইতিহাস কথা বলে, একথাও ঠিক। এধরনের বর্বরতা এখনও দেখা যায় এবং এধরনের শাসক বা গডফাদারদের বিচার মধ্যযুগে যেমন করতে কেউ সাহস পেতো না বর্তমান যুগেও ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীদের দ্বারা শিউরে ওঠা হত্যাকান্ডের বিচার এখনও হয় না। যদি কেউ সে উদ্যোগ নেয় তবে তাকে হতে হবে রক্তাক্ত হত্যাকান্ডের শিকার।

শহীদ আহম্মদ খান (মন্টু), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম